তারিখ ৩1 AUG 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষা এবং ছাত্র রাজনীতি

সমাজচিন্তা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

শিক্ষাবিদ ও সমাজ বিশ্লেষক

বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞান সৃষ্টি ও প্রয়োগের স্থান হিসেবেই সারাবিশ্বে দেখা হয়। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। সৃষ্টিশীলতা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়। জ্ঞানের বিকাশ সামাজিকতার মধ্য দিয়েই ঘটে। আবার সৃষ্টিশীলতার জন্য প্রয়োজন প্রসারিত হৃদয়। আর সেই প্রসারিত হৃদয় সামাজিকতার অংশ। জ্ঞানের বিকাশ ও হৃদয়ের প্রসার– এ দুটি বিষয় ছাড়া শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয় না এবং বিশ্ববিদ্যালয় তার নামের যথার্থতা পায় না। সেদিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার নামের যথার্থতা কিছুটা হলেও রাখতে পেরেছে। এ বিদ্যাপীঠ সৃষ্টিশীল মানুষ যেমন তৈরি করেছে, তেমনি তৈরি করেছে হৃদয়বান মানুষও। সামাজিকভাবে এ বিশ্ববিদ্যালয় অনেকটা নীরবে একটি বড় কাজ করেছে। সেটি হলো, এ অঞ্চলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশে বড় ভূমিকা রাখা। স্বাধীনতা অর্জনের আগের কথা বলছি, যখন এ দেশের সাধারণ পরিবারের অনেক ছেলেমেয়ে কলকাতায় অনেক টাকা খরচ করে পড়াশোনা করতে যেতে পারত না, সেসব ছেলেমেয়ে আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছে। রাজনীতি থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্যেও তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিকাশের সময় তাদের প্রতিযোগিতা করতে হয়েছে। বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে, বিশেষ করে ব্রিটিশ শাসনামলের শাসক। পাকিস্তান শাসনামলে পাকিস্তানি শাসকরা ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী। পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পর নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরি হলো– অবাঙালিরা। সেটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপলব্ধি করতে পেরেছিল বলেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত।

সব শ্রেণির মানুষের দুঃখ-কষ্ট বোঝা, বিশেষ করে কৃষকের দুর্দশা বোঝা, ব্রিটিশ ও পাকিস্তান শাসনামলে যে বৈষম্য ছিল, তার অবসানের ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত হৃদয়বান মানুষের দায়িত্বের অংশ। পরবর্তী সময়ে তা আর নেওয়া হয়নি। না নেওয়ার কারণ ছিল জাতীয়তাবাদী ও সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া। জাতীয়তাবাদীরা ক্ষমতায় এসে নিজ স্বার্থ হাসিলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কৃষকসহ অন্যান্য শ্রেণির মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতীয়তাবাদীরা প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে পারেনি। তারা রূপান্তরিত হয়েছিল শাসকে। রাষ্ট্রের মালিক হয়ে গিয়ে তারা রাষ্ট্রকে আর শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করতে পারেনি। যে মধ্যবিত্তের প্রসার পাকিস্তান শাসনামলে ঘটেছিল, তা পরবর্তী সময়েও অব্যাহত ছিল। তবে অবস্থার পরিবর্তনে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভেতর ভাঙন দেখা দেয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রসারের পথ ছিল পুঁজিবাদ, যা আগেও ছিল এখনও রয়েছে। পুঁজিবাদের আধিপত্য ও অন্তর্ঘাতে মধ্যবিত্ত দুই ভাগ হয়ে গেল। একটা অংশ উচ্চবিত্ত, আরেকটি অংশ হলো নিম্নবিত্ত। যারা ক্ষমতার কাছে যেতে ও লুণ্ঠন করতে পেরেছিল, ব্যবসা-বাণিজ্য দখল করতে পেরেছিল, তারাই উচ্চবিত্ত হয়ে উঠল। আর যারা তা করতে পারেনি তারা নিম্নবিত্তের গণ্ডিতে থেকে গেল। এখন সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণির তেমন কোনো রাজনৈতিক ভূমিকা নেই। অন্যদিকে উচ্চবিত্তের ভূমিকা রাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধের মধ্যে আর থাকল না। ক্ষমতার প্রশ্নে জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। সেখানে দ্বিদলীয় রাজনীতি স্থান করে নিল, যেখানে শুধুই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। জনগণের মুক্তি ও সমাজ পরিবর্তনে এ রাজনীতির ভূমিকা নেই। অতীতে যারা ক্ষমতায় ছিল তাদের কেউ কেউ ছাত্র রাজনীতি চায়নি। সে কারণেই তারা ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কথা বলেছিল। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান শাসনামলে শিক্ষার্থীরা ছিল রাজনীতির বড় একটা অংশ। সে সময় জাতীয়তাবাদীরাও ছাত্র আন্দোলনে উৎসাহ দিয়েছিলেন। কেননা, ছাত্ররাই ছিল রাষ্ট্রক্ষমতা পরিবর্তনের প্রধান হাতিয়ার। তখন অন্য শ্রেণি-পেশার মানুষের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য ছিল না বলেই ছাত্রদের রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয়তাবাদীরা যখন ক্ষমতা পেয়েছে তখন আর ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা তারা বোধ করেনি। ছাত্ররা রাজনীতি করে সমাজ পরিবর্তনের জন্য। সেই স্বপ্ন এখনও তারা লালন করে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী শক্তি চায় না সমাজ পরিবর্তন হোক। ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ হয়নি; কিন্তু দলাদলির রাজনীতি শুরু হয়েছিল। যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে, সে দলের ছাত্র সংগঠন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য বিস্তার করে। এমন তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। অন্য দলকে সরিয়ে দেয়। ফলে এখন আর সেই সমাজ পরিবর্তনের রাজনীতি নেই। হৃদয়বান মানুষের কথা বলেছি, যার সঙ্গে সমাজ পরিবর্তনের সম্পর্ক আছে, সেখানে আজ পুঁজিবাদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে আর আদর্শবাদের পতন ঘটেছে। সমাজতান্ত্রিক ধারা প্রবল হয়নি। ছাত্র রাজনীতি এখন সমাজ পরিবর্তন আর রাষ্ট্রবিরোধিতার পক্ষে নেই। এ ছাড়া ছাত্রদের বিরাজনীতিকীকরণও হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সমাজ পরিবর্তনের রাজনীতি যারা করত, তাদের দলগুলো নিজ অবস্থান থেকে সরে গেছে। তাদের বিচ্যুতি ঘটেছে। তবে কিছু ছাত্র সংগঠন কাজ করছে এখনও।

ছাত্র সংসদ না থাকলে নেতৃত্ব তৈরি হবে না। সুতরাং শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে কোনো অন্দোলনও গড়ে উঠবে না। বিশ্ববিদ্যালয় কখনোই একটি কারিগরি প্রতিষ্ঠান নয়, এটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এখানে ক্লাসরুম, কমনরুম, লাইব্রেরি, খেলার মাঠ, নাটক, গান-বিতর্ক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হৃদয়কে প্রসারিত করার শিক্ষা দেওয়া হবে। সেই অনুশীলন এখন চোখে পড়ে না। নেতৃত্ব তৈরির কাজ বিশ্ববিদ্যালয় এখন আর করছে না। সে জন্য আদর্শবান এবং হৃদয়বান মানুষ তৈরি হচ্ছে না। আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। এটি আমাদের নেতৃত্বের দিক থেকে দুর্বল করছে

বিশ্ববিদ্যালয় কেবল দক্ষ জনবল সরবরাহ করেছে তাই নয়, নেতৃত্বও তৈরি করেছে। পেশাগত জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তারা নেতৃত্ব দিয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, এখন বিশ্ববিদ্যালয় আর সেই নেতৃত্ব তৈরি করতে পারছে না। এর প্রধান কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন আর ছাত্র সংসদ নেই। এটা অকল্পনীয়। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা প্রদানের স্থান নয়; সামাজিক প্রতিষ্ঠানও বটে। একাত্তরের স্বাধীনতার আগে সব শাসনামলেই ছাত্র সংসদ ছিল। স্বাধীনতার পরও অনেক দিন তা ছিল। '৯০-পরবর্তী ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়নি। শাসক শ্রেণির এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথাও নেই। তারা ছাত্র-মতামতকে সব সময় ভয় পায়। কেননা, ছাত্ররা সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখে, যেখানে শাসকরা সব সময় প্রতিপক্ষ হিসেবে অবস্থান নেয়। ছাত্র সংসদ না থাকলে নেতৃত্ব তৈরি হবে না। সুতরাং শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে কোনো অন্দোলনও গড়ে উঠবে না।

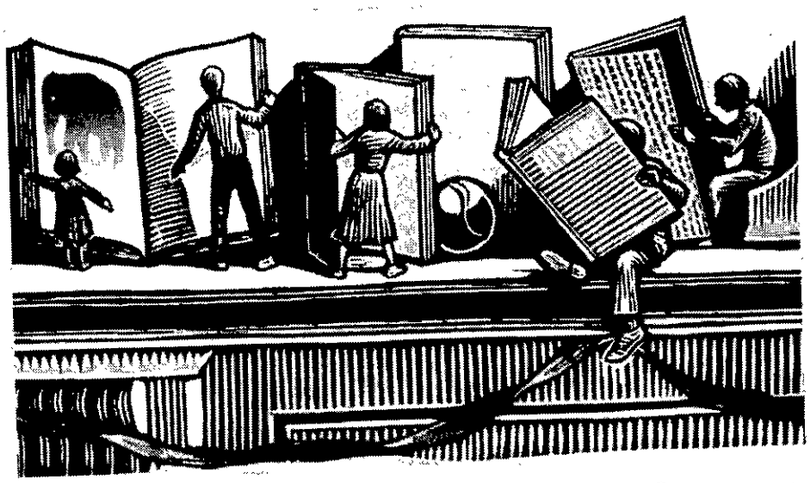

বিশ্ববিদ্যালয় কখনোই একটি কারিগরি প্রতিষ্ঠান নয়, এটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এখানে ক্লাসরুম, কমনরুম, লাইব্রেরি, খেলার মাঠ, নাটক, গান-বিতর্ক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হৃদয়কে প্রসারিত করার শিক্ষা দেওয়া হবে। সেই অনুশীলন এখন চোখে পড়ে না। নেতৃত্ব তৈরির কাজ বিশ্ববিদ্যালয় এখন আর করছে না। সে জন্য আদর্শবান এবং হৃদয়বান মানুষ তৈরি হচ্ছে না। আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। এটি আমাদের নেতৃত্বের দিক থেকে দুর্বল করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নামছে বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, মান নেমেছে বলাই যায়। আগে একটা পড়পড়তা, শিক্ষার ধরন ছিল। তখন শিক্ষার্থীদের মান ছিল একই রকম। উচ্চশিক্ষা নিতে যারা আসত, তারা একটি নির্দিষ্ট ছকের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা নিত। তখন তারা